আসামের বাংলা কবিতা

অমিতাভ দেব চৌধুরী

এই যে কাণ্ড, পত্র পুষ্পে ভরা,
'শিকড়ের নথিপত্র' আছে কিছু?
যে শিকড় থেকে তুমি আজ, এইখানে
এই মাটিতে, তার জুড়িবুটি কোনো!
ঠাকুর্দা তোমার কি শুধু জমিজিরেত ঘেঁটেছেন,
কীর্তন গেয়েছেন চোখ মুদে, হুঁকো টেনেছেন, রজনীগন্ধার
সৌরভের রাতে
ঠাকুমার সাথে মিলেমিশে
তোমার জন্য রেখে গেছেন, একগাদা
জ্যাঠা, পিসি, কাকা।

তুমি যে তোমার পিতার পুত্র,
তোমার পিতা যে তাঁহার পিতার পুত্র,
জন্মেছ কোন দেশে,
কোথায় তোমার দেশ,
আছে কি সরকারি শিলমোহর?

(সঞ্জয় চক্রবর্তী)

আনুমানিক এক কোটি বাঙালির জন্ম ও ধাত্রীভূমি আসাম। সরকারি হিসেবমতে অবশ্য ওই এক কোটি সংখ্যাটি সত্তর আর আশি লক্ষের মাঝামাঝি কোনও একটা অংকে এসে থিতু হবে। তবু এ কথা সবারই জানা, স্মরণাতীত কাল থেকে আসামে বাঙালিরা রয়েছেন। আসামের দুটি উপত্যকার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাঙালি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও বরাক উপত্যকা তো পুরোপুরিই বাঙালিপ্রধান। আর বাঙালি যেখানে, কবিতাও সেখানে।

আসামের বাংলা কবিতারও নানান মুখ। তার কোনওটা সুখের, কোনওটা দুঃখের। কোনওটা বা গভীর আনন্দের। কোনওটা উত্তুঙ্গ যৌনতার। কোনওটা শান্ত উদাসীনতার। বিষণ্ণতার, প্রকৃতিকাতরতার, প্রেমের, মিলনের, বিরহের। তবু এই এত এত মুখের ভিড়ে যে মুখটি আসামের বাংলা কবিতার এক চিরাকালীন সত্যের মতো, যে সুরটি আসামের বাংলা কবিতার এক ধ্রুবপদের মতো—তা হলো দেশ খোঁজার সুর। সেই রুবে থেকে আসামের বাংলা কবিতা তার দেশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই দেশ কখনও ভূগোলের দেশ, কখনও ইতিহাসের। আর স্বাধীনতা-পূর্ব এবং স্বাধীনতা-উত্তর আসামের ইতিহাস ঘাঁটলে আমরা দেখি, আসামের ভূগোল বারবার তার অন্তর্গত রাজনীতি অর্থাৎ ইতিহাসের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে।

এই ভূগোল আসামের বাঙালির বন্ধু। এই ভূগোলের মূল যে সেই প্রকৃতি যেমন আসামের অগণন বাঙালির জীবন ও জীবিকার অবলম্বন, তেমনি তা অবলম্বন কবিতার সৌন্দর্য চেতনার। আবার এই ভূগোল আসামের বাঙালির শত্রু। বারবার এই ভূগোল তাকে উৎখাত করতে চেয়েছে। এই ভূগোল তাকে ডেকে বলেছে : তুমি এ দেশে বহিরাগত। এ দেশ তোমার নয়। এই দেশের আকাশ-বাতাস, মাটি, জল—যা কিছুই তুমি ভোগ করে চলেছো, তা তোমার নয়। তুমি আসলে অন্যের ভোগ্য আকাশ-বাতাস, মাটি, জল, নীরবতা, শান্তি সব নিজের করে নিতে চাইছো। অন্যের দেশকে নিজের ভোগ্য বানাচ্ছ।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যদি কেউ কোথাও আসামের বাংলা কবিতা-চর্চা নিয়ে লিখতেন, তিনি ভাবতেও পারতেন না মেঘালয় বলে কোনও আলাদা রাজ্যের অস্তিত্বকে, বিশ্বাসই করতে পারতেন না শিলং-কেন্দ্রহীন কোনও আসামের কথা। ত্রিপুরা, মণিপুর, এই দুই আলাদা রাজ্য ছাড়া, নেফা-মাথায় তখনকার আসাম ছিল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় রাজ্য। আবার ১৯০৫ সালে আসাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল তৎকালীন আসাম-বেঙ্গল প্রভিন্সের। ১৮৭৪ সালে রাজস্ব-ঘাটতির ছুতোয় সিলেটকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল আসামের সঙ্গে।

বারবার আসামের ভূগোল রাজনীতির শিকার হয়েছে। আবার আজকের রাজনীতিই তো আগামীদিনের কাছে ইতিহাস, তাই আমরা বলতে পারি যে, এখানকার ভূগোল বারবার ইতিহাসের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেয়েছে।

সুতরাং এটা, তেমন আশ্চর্যজনক কোনও ঘটনা নয় যে আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আধুনিক বাংলা কবিতা-চর্চার একটি প্রধান ধারার পথপ্রদর্শক যিনি ছিলেন, তিনি মূলত এক ইতিহাসবিদ। ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত সদ্যপ্রয়াত অমলেন্দু গুহ-র 'লুইত পারের গাথা' দিয়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আধুনিক বাংলা কাব্য-চর্চার সূত্রপাত। যদিও অমলেন্দুর 'লুইত পারের গাথা'-র অন্যতম প্রেরণা ছিলেন এক গায়ক এবং বামপন্থী অ্যাকটিভিস্ট। সেই গায়ক-অ্যাকটিভিস্ট হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'সীমান্ত প্রহরী'-র কবিতাগুলি আগে লিখিত হলেও ছাপা হয়েছিল 'লুইত পারের গাথা'-র পরে, ১৯৬১ সালে। পরবর্তীকালে এই ধারা যে সবসময় বামপন্থী-আদর্শে-বিশ্বাসী কবিদেরই কবিতায় সমৃদ্ধ হয়েছে, তা কিন্তু মোটেই নয়। দেবাশিস তরফদারের মতো বরাক উপত্যকার নন্দনসচেতন কবিও যখন লেখেন—

> চতুঃসীমা বলা হল। হে পাঠক, ভ্রূ-কুঞ্চিত, সাম্রাজ্যবাদের চিহ্ন পেলে বুঝি?
> সত্য তাই! কবিমন সতত সাম্রাজ্য গড়ে, যেরকম বালকেরা অবিরত
> সম্পদ কুড়াতে থাকে, সিগারেট বাক্স, ভাঙা কাপের হাতল, কার্ড, পরিত্যক্ত
> ট্রামের টিকিট, ভরে ঝুলি তার অগণিত মহার্ঘ বাতিল পণ্যে, আমিও তো
> তেমনি সম্পদলোভী, পৃথিবীর পথে পথে যেখানে যা পড়েছিল সব চুরি করে
> গড়েছি ভাণ্ডার তার প্রতিটি মাটির ঢেলা সুবর্ণগহনাজ্ঞানে রাখি যত্ন-ভরে।
> যেমন হারাংগাজাও। সামান্য সে-জনপদ। শ্যামল পর্বতে ঘেরা। ছোট নদী।
> কেউ-বা-সিলেটি, কেউ অসমিয়া, হিন্দিভাষী, ডিমাছা, নেপালি কিংবা আর কেউ।
> বন্দরে খালাসি যথা, ভিন্ন বুলি, ভিন্ন চাল, একত্রে বাজারে মেশে, চা দোকানে।
> পচা বান্ খেতে খেতে মিষ্টির দোকানে বসে শুনি কতরূপ ভাষা, লাগে ঢেউ

অকস্মাৎ মর্মদেশে, ওই যে কাছাড়ি নার্স, হিন্দুস্থানি ড্রাইভার, সিলেটি মাস্টার
...সবাইকে মনে মনে চুরি করি, উহাদের কাউকে ছাড়ি না আমি, প্রত্যেকে আমার।

আমরা অবাক না-হয়ে পারি না যে সেই কবেকার প্রেসিডেন্সি কলেজ জীবনে লেখা অমলেন্দু গুহ-র 'লুইত পারের গাথা'-র কবিতাগুলি সরাসরি প্রভাবিত না-করলেও, কত অনায়াসে ভবিষ্যৎ-কবিদের হৃদয়স্পন্দনগুলির পূর্বানুমান করতে পেরেছিল।

স্বাভাবিকভাবেই, তাহলে এখন প্রশ্ন ওঠে—কী ছিল 'লুইত পারের গাথা'-র কাব্যবীজ? কি ছিল তার সারাৎসার?

এখানে স্বপ্নের মতো আমার সত্তার সাথে
জড়ানো, ছড়ানো এক দেশ—
আমি ভালোবাসি তার বনরাজিনীল পরিবেশ।
কখনো শীতের সাঁঝে বুনো হাঁস ঝাঁক বেঁধে ওড়ে,
কমলার কুঞ্জে কুঞ্জে রসলুব্ধ মৌমাছির ভিড়,
রুপালি আশার মতো বরফনিবিড়
ভুটান পাহাড়চূড়া ঝিলকিয়ে ওঠে!
কখনো-বা প্রথম বৈশাখে
শিপিনী কুমারী সাজে আনকোরা রিহা-মেখেলায়
ফাটা শিমুলের মতো কিযানের উড়ে চলে মন,
বহাগীর আমন্ত্রণ
ফুটে ওঠে নাহরের শাখায় শাখায়,
অজানা লতার গন্ধে পথ চলা দায়!
আষাঢ়ে শুনেছি আমি যৌবনের গান
কলঙের কলোচ্ছ্বাসে, বিশপের মঙ্গুল গর্জনে,
সিঁড়িকাটা জুমখেত বুক পেতে ধরে রাখে জল,
ভৈয়ামের ভিজে মাটি মাখামাখি লাঙলের মুখে,
লুইতের গতিবেগে ভেসে যায় স্থবির পাষাণ!
এই তো আমার দেশ—
শান্তির নিবিড় নীড় আমার আসাম।
আমার নাড়িতে জাগে এর যত নদীবন পাহাড়ভৈয়াম!

দীর্ঘ এই কবিতায় কবির বামপন্থী বিশ্বাস-সঞ্জাত আশাবাদ (যার সঙ্গে কাব্যবীজের কোনও যোগসূত্র নেই) ইত্যাদি ছাড়া যা আছে তা হলো এক পরিব্যাপ্ত ভূগোলচেতনা। এই ভূগোলচেতনার বীজটুকুই কবি আহরণ করেছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কবিতা থেকে।

এই ভূগোলচেতনাকে যদি একটু বিশ্লেষণ করি, তাহলে কী পাই? পাই রক্তের সংস্কৃতির বাইরের এক দেশকে নতুন করে খুঁজে পাওয়ার রোমাঞ্চ। আসামের বাংলা কবিতার সেই অর্থে এই একটিই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', বাকিগুলি নীল পাহাড় (নীলাচল) আর লাল নদী (লোহিত বা ব্রহ্মপুত্র) কিংবা বরাক একটি নদীর নাম। এই দেশের খোঁজের পাশাপাশি অমলেন্দুর কবিতায় লুকিয়ে আছে এক প্রতিবেশ-চেতনাও—এমনই সে চেতনা যাকে বাদ দিলে আত্মপরিচয়ই অসমাপ্ত থাকে।

বিষয়টিকে একটু বিশদ করার প্রয়োজন মনে করি। যে-কোনও বাঙালিরই মানসভুবন কলকাতা, আর, দেশভাগে-বাস্তুচ্যুত বাঙালির শিকড়ভুবন পূর্ববঙ্গ। যে কোনও বাঙালি কবিরই নান্দনিক জগৎ কলকাতায়, সেখান থেকে ইশারা আসে, খবর আসে। সেখানকার আলো-হাওয়ায় কেলাসিত হয়ে বহির্বিশ্বও তার কাছে এসে ধরা দেয়। আবার তার প্রাণের শিকড় তো, অন্তত গত শতাব্দী পর্যন্ত, চারিয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশের কোনও চোখে না-দেখা, নাম-শোনা কিংবা চোখের-দেখা-প্রাণের-কথায়-ভরা গ্রামে। সেখান থেকে কী আসতো? আসতো স্মৃতি আর রূপকথা। কিন্তু তার বাস্তবের পৃথিবী? দেশভাগের পর বাস্তুচ্যুত বাঙালির বাসভূমি তো ছড়িয়ে আছে আবিশ্ব: নিউইয়র্কের পানশালা থেকে আসাম কিংবা মিজোরামের অনাবাদী জমির পাশের ঘাসবৃক্ষ পর্যন্ত।

এখন, এই বাস্তবের পৃথিবীর শিশিরবিন্দুগুলিকে ভালো না-বেসে, তার থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে কবি যদি শুধু ঘুরে বেড়ান এক অতৃপ্ত মানসলোকে কিংবা স্মৃতির পৃথিবীতে —তাঁর এই পর্যটন তো, পুরাণের ভাষায় বললে, গণেশের সেই মাতৃপ্রদক্ষিণ, যা আসলে কার্তিকের প্রকৃত ভ্রমণটিকে দাবিয়ে রাখার জন্য বানানো এক নিপুণ কথার ফাঁদ।

তো, একজন কবির তো তাঁর বাস্তবের আসল দেশটাকে জানা চাই। কথার ফাঁদ কতদিন আটকে রাখবে তাঁর কবিত্বকে? আর এই কথার ফাঁদ থেকে মুক্তি পেয়েছে আসামের বাংলা কবিতা তার আশ্চর্য ভূগোল-চেতনায়। মূলত দু'টি বিশ্বযুদ্ধের কারণে বিগত শতাব্দীটি ছিল কাঁটাতারের আর উদ্বাস্তু-প্রব্রজনের। তার ভূগোল-চেতনার মাধ্যমে আসামের বাংলা কবিতা সব মানস-কাঁটাতারকে অগ্রাহ্য করার শক্তি পেয়েছে।

এই ভৌগোলিক দেশ যখন মনের দেশ হয়ে থাকেনি, যখন—বিশেষত আশির দশকে—তা নতুন করে উদ্বাস্তু হবার ভয় জাগিয়ে তুলেছে মনে, তখনই জেগে উঠেছেন একা ঊর্ধ্বেন্দু দাশ, তাঁর 'বিষণ্ণ পরবাস : নির্বাসন নয়' উপলব্ধি নিয়ে।

> সব ছেড়ে চলে যাব—যেমন হাঁসেরা যায়—
> ... ...
> এইসব গিরি-নদী-অরণ্যের সীমানা ছাড়িয়ে
> দেহ থেকে দেহান্তরে, খুঁজে নিতে হেমপাত্র
> মৃত্যুজিৎ আত্মার আশ্রয়—
> বিষণ্ণ পরবাস! নির্বাসন নয়।...

কিংবা জেগে আছেন তুলনামূলকভাবে একটু কম পরিচিত ক্ষিতীশ রায়, যিনি তাঁর 'চির চেনেহী আশ্রয়দাত্রী/চির মরমর দেশ নতুন মাতৃভূমি'তে খুঁজে পেয়েছেন তাঁর 'বাংলাদেশে হারিয়ে যাওয়া/পুরনো সেই ঘর'। জেগে আছেন অনালোচিত জীবন নাথও, যাঁর 'স্বদেশ! স্বদেশ কোথায়?' প্রশ্নটিই মানচিত্র নিয়ে ইতিহাসের নানা কাটাকুটি খেলার দিকে প্রবল বেগে ধেয়ে যায়। এই ঘরানারই আরেকটু সম্প্রসারিত রূপ সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত রবীন্দ্র সরকার আর এর বহমানতার স্রোতে তরী ভাসিয়ে আছেন প্রমোদরঞ্জন সাহা-র মতো কম পরিচিত কবিরা—যাঁদের 'বিহুরানি হয়েছিল বৈজয়ন্তী/যার পিতা এক প্রব্রজিত পুরুষ/যার ধমনীতে প্রজ্জ্বলিত পদ্মা-মেঘনার আদর।' আশির দশকে এসে এই ধারাটিই দেবীপ্রসাদ সিংহর কলমে 'গ্রহণ' আর 'নষ্টবেলা'-র স্বর খুঁজে পায় কিংবা কিশোর ভট্টাচার্যের

বিহুগীতের বদলে একটি কবিতার গান হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, কিংবা সুব্রত চৌধুরীর 'নীলাচল'-এ 'রক্তের গান, পেঁপার শৃঙ্গার নাদ' ছুঁয়ে সঞ্জয় চক্রবর্তীতে এসে 'একা, নির্জন বিষণ্ণ এক ঘরে' পেতে নেয় 'উৎসবের টেবিল'। আবার নিখিল তালুকদার যখন বলেন—

ঠিকানা আমার একটাই
মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র।

তখন বোঝা যায় ভূগোল-কাতর আসামের কবিতার ঘর-খোঁজা এখনও শেষ হয়নি। চিন্ময়কুমার দাস, কল্লোল ভৌমিক, শিবাশিস চট্টোপাধ্যায়, তপন মহন্ত, দীপিকা বিশ্বাস কিংবা সমর দেব, রমানাথ ভট্টাচার্য, সর্বোপরি পঞ্চাশের দশকের উজ্জ্বলতম কবি বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের কাব্যমর্মরগুলি হয়তো সরাসরি কোথাও এই ধারাটির প্রতি সচেতন পক্ষপাত দেখায় না—বরং ব্যক্তিপ্রতিভার নানারকমের শিলমোহর আবিষ্কারের প্রতি অধিকতর উন্মুখ থাকে, তবু এই ভূগোলের ডাকে কি স্বয়ং বীরেন্দ্রনাথও বারবার সাড়া দেননি? ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের কবিতার বইয়ের নামটিই স্বয়ং এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'পরবাসী'। আর বরাক উপত্যকা থেকে প্রকাশিত এক উজ্জ্বল কবিতা-সংকলনের নাম হিসেবেও তো বীরেন্দ্রনাথের কবিতারই একটি লাইন অমোঘ হয়ে উঠেছিল। 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে' শব্দবন্ধটি কি কোথাও খুবই স্পষ্টভাবে লুকিয়ে রাখেনি এক ভূগোল-চেতনারই রৌদ্রালোককে?

বরাক উপত্যকার কবিতা তার সূচনাপর্বে অনেক বেশি দায়বদ্ধতা দেখিয়েছিল নন্দন সচেতনতার প্রতি। ১৯৫৭ সালে হাইলাকান্দি শহর থেকে প্রকাশিত যে 'স্বপ্নিল' কবিতাপত্রটিকে সারা আসামের প্রথম আধুনিক কাব্য-বিষয়ক-পত্রিকা বলে মেনে নেওয়া হয়ে থাকে, সেই 'স্বপ্নিল' যুগের প্রধানতম কবি করুণাসিন্ধু দে-র অবিস্মরণীয় বইটির নামও কি তেমনি প্রবাদের মতো ছড়িয়ে দেয়নি সেই ভূগোল-চেতনা আর প্রতিবেশ চেতনার বীজটিকে? 'কণ্ঠে পারিপার্শ্বিকের মালা'-র মতো নাম, মনে হয়, এই উত্তর-পূর্বাঞ্চল ছাড়া আর কোনও বঙ্গভুবন থেকে উঠে আসতেই পারে না। আবার 'অতন্দ্র' যুগের অন্যতম প্রবাদপুরুষ উদয়ন ঘোষ যে তাঁর সারাজীবনের কবিতা-সম্ভারের পংক্তিতে পংক্তিতে ছড়িয়ে দেন সারা পৃথিবীর ভৌগোলিক স্থাননামগুলি, তাও কি এই অসামান্য উচ্চাশায়ই নয় যে কবি চান তাঁর নিজের অবহেলিত, প্রান্তীয় ভূগোলটিকে বিশ্ব-ভূগোলের মানচিত্রে গেঁথে দিতে? উদয়ন যখন তাঁর একটি ছড়ার সব শেষে উচ্চারণ করেন যে তাঁর বাড়ি আসলে মস্কোতেও নয়, প্যারিসেও নয়, তা 'রাঙ্গিরখাড়ি'তে, তখন উদয়নের ভুবন-বিহার এক অন্য তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয় আমাদের মনে। কিংবা ১৯৬৭ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত 'সাহিত্য' নামক পত্রিকার সম্পাদক বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের কবিতায়ও এক ঘোর-লাগা ভূগোলভ্রমণ আছে : জাটিঙ্গা থেকে বকরিহাওর সব ঠিকানাকেই তা বাড়ি বানিয়ে নিয়েছে। শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর কবিতায়, অন্তত তাঁর কাব্যজীবনের মাঝামাঝি পর্ব থেকে শেষ পর্ব পর্যন্ত দেখি আরেক রকমের ভূগোল ভ্রমণের হদিশ—যেখানে শক্তিপদ বারবার, বারবার ফিরে যাচ্ছেন সুদূর বাল্যে, সেই কবেকার ফেলে-আসা,ছেড়ে-আসতে-বাধ্য-হওয়া পূর্ববঙ্গীয় শৈশব-কৈশোরে। সেই চাঁপায়, সেই বেলফুলে কিংবা রূপকথায় আর স্মৃতিতে। সেই স্মৃতিকে নিয়ে দার্শনিকতায়—

আমরা কোথাও যাই না হাহাকার বুকে নিয়ে ফিরি
তোমার পদ্মার পার আমার বরাক-জিরি-চিরি
যখন যেভাবে হোক, পিতৃপুরুষেরা গেছে
কলেরায় কিংবা কালাজ্বরে
সুখের কুলকুচো আর দুঃখের ঢেঁকুরে পেট ভরে
আমাদের, আগুনের চারদিকে গোল হয়ে বসে
থাকে যারা।
তাদের শরীর নেই, জিভ নেই, তবু এক তুমুল পাহারা
কেবলি জাগিয়ে রাখে, কেবলি ভুলিয়ে রাখে মন
কতক্ষণ আর কতক্ষণ?

বরাক উপত্যকার কাছাড় নামক জেলাটি ব্রিটিশ শাসনের আওতায় আসে ১৮৩২ সালে (বেসরকারি ভাবে ১৮৩০ সালে, শেষ ডিমাছা রাজা গোবিন্দচন্দ্রের হত্যাকাণ্ডের পর), আবার করিমগঞ্জ কিন্তু তখনকার সিলেটেরই অঙ্গ ছিল। কাছাড়ে চা-শিল্পের পত্তন হয় ১৮৫৫ সালে আর শিলচর শহর আস্তে আস্তে পরিচিত হয়ে ওঠে চা-করদের শহর হিসেবে। ১৮৯৯ সালে রেললাইন স্থাপিত হবার পর শহরটির অনেক প্রসার ঘটে। যদিও তখনকার সেই শহরে 'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ারস্ অব সলিচিউড'-এর সেই মেয়ে-দর্শকের মতো ট্রেন দেখে কেউ ব'লে ওঠেনি' 'It's coming...something frightful, like a kitchen dragging a village behind it.' (পৃ: ২১০), এই রেলপথ তখনকার সেই উপত্যকার নিঃসঙ্গতাকেই ভেঙে কেবল খান খান করেনি, একই সঙ্গে পূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ডেকে এনেছিল অগণন মজুরদের। যাদের যন্ত্রণাকাতর হৃদয় পরবর্তীতে অনুবাদিত হয়েছিল এই গানের ভাষায় :

চল মিনি আসাম যাব
ও তোর দেশে বড় দুখ রে
আসাম দেশে যাব মিনি
চা বাগান হরিয়া।

১৮৭৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর রাজস্ব-ঘাটতির ছুতোয় সিলেটকে তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে আলাদা ক'রে জুড়ে দেওয়া হলো আসামের সঙ্গে। আর ১৯৪৭ সালে ওই একই সিলেটকে বিষফোঁড়ার মতো অপারেশন করে সরিয়ে দেওয়া হয় আসামের রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে। এটা, সুতরাং, খুবই স্পষ্ট যে বরাক উপত্যকার অগণন বঙ্গভাষাভাষীর কাছে উপত্যকাটি চিরকালই ছিল তৎকালীন সুরমা উপত্যকার এক সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণ। এই অর্থে, সুরমা উপত্যকা থেকে বরাক উপত্যকার অঙ্গহানি কোনও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের নামান্তর হয়ে ওঠেনি, মূলত এক ভৌগোলিক স্থানচ্যুতিরই অন্য নাম হয়ে উঠেছিল।

পরবর্তী যুগের দিলীপকান্তি লস্কর তো এই ভূগোলের ফাঁদকেই বিষয় বানিয়ে নেন তাঁর কবিতার—

আমি কোত্থেকে এসেছি, তার জবাবে যখন বললাম
করিমগঞ্জ, আসাম

বাংলাভাষার পঞ্চদশ শহিদের ভূমিতে আমার বাস।
তিনি তখন একেবারে আক্ষরিক অর্থেই আমাকে ভিরমি
খাইয়ে দিয়ে বললেন
ও! বাংলাদেশ? তা-ই বলুন!

প্রবাসী মনোতোষ চক্রবর্তীর মানস-পৃথিবীতে সূর্যোদয় আজও হয় ভুবন পাহাড়ে। আসলে যাঁরা একটা ভূগোল ছেড়ে চলে যান, তাঁরা তাঁদের মনের ভিতর নিয়ে যান এক-একটা দেশের ছবি। সেই দেশ মনের দেশ বলেই কখনও বদলায় না, বরং সময়ের ধুলিবালি থেকে ওই মনের দেশের মানচিত্রকে ঝাড়পোঁছ করে উজ্জ্বলতায় ভরিয়ে তোলে মনই। হয়তো ঠিক এ কারণেই শিলচরের সন্তান, মহানাগরিক রণজিৎ দাশের কবিতায়ও হঠাৎ কখনও জেগে ওঠে এক মানসভূগোল যাত্রা—

এত রাতে আমি একা বাবাকে পাহারা দিচ্ছি
ভাইয়েরা ঘুমিয়ে আছে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে
উঠোনের চারদিক নারকেল-সুপুরিগাছে ঘেরা
বাবার নিজের হাতে পোঁতা সেই গাছগুলি ফিকে জ্যোৎস্নায়
লম্বা দুঃখী ছায়া ফেলে মৃত্যুর পথ আগলেছে।
... ...
বাবার নিস্তব্ধ মুখে ফুটে আছে বাবার জীবন—
দেশভাগে নিঃস্ব এক উদ্বাস্তুর ভূমণ্ডল, যাত্রা, অভ্যুদয়।
উদয়াস্ত কী আনন্দ পেতেন জীবনযুদ্ধে, ক্রীড়ামগ্ন
বালকের মতো
দুরন্ত, অপরাজেয়, সৎ, সমীচীন!
নীরবে শায়িত ওই বিশাল যোদ্ধার টুপি পালকে রঙিন।
উঠোনের অন্ধকারে তাঁর বন্ধু প্রতীক্ষা-নিশ্চল—
দীর্ঘকায়, কীর্তনীয়া, গলায় ঝোলানো খোল, দুই
চোখে জল।

এই কবিতা যতবারই পড়ি-না কেন, আমার দু'চোখের বাইরে নয়, ভেতরে অশ্রুপাত হয়। মৃত্যু নিয়ে এত এত কবিতা পড়েছি বাংলাভাষায় কিন্তু মৃত্যুর এই দীর্ঘকায় কীর্তনীয়া-রূপটি একটি ভৌগোলিক সংস্কৃতিরই উত্তরাধিকারকে স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের—যেরকম বার্গম্যানের অবিস্মরণীয় একটি ছবিতে সেই নাইটের মৃত্যুর সঙ্গে দাবা-খেলা মনে করায় ইউরোপের মধ্যযুগের কথা।

পঞ্চাশের শেষদিক এবং ষাটের দশককে যদি ধরে নিই বরাক উপত্যকার কবিতাচর্চার সুবর্ণযুগ হিসেবে, তাহলে এই যুগের নন্দনপ্রস্থানের চিহ্নগুলিই সচরাচর বেশি বেশি করে চোখে পড়ে আমাদের। আমরা ভুলে যাই নান্দনিক উৎকর্ষের অন্তরালে বয়ে-যাওয়া নিঃশব্দ ভূগোল-চেতনার চিহ্নগুলিকে। কিন্তু ভূগোল-চেতনা আরও তীব্রভাবে আছে এই যুগের পূর্ববর্তী কোনও কোনও কবির লেখায়। মনে রাখতে হবে, সেই কবিদের প্রায় সবারই সাংস্কৃতিক রক্ত ছিল পূর্ববঙ্গের, এ-দেশে এসে কিংবা এ-দেশেই বড় হতে হতে রক্তের

সম্পর্কের চেয়েও বড় করে তুলে ধরতে পেরেছিলেন এঁরা এক প্রতিবেশ কিংবা প্রতিবেশী চেতনার পতাকাকে। আর একটি কথা—করুণাসিন্ধু দে, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, উদয়ন ঘোষ, তপোধীর ভট্টাচার্য, বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য—এঁরা সবাই পরবর্তী জীবনে বামপন্থায় বিশ্বাসী হয়ে পড়লেও যে ভূগোল-চেতনার কথা আমরা এখন বলছি তা কিন্তু শেষপর্যন্ত আটকে থাকেনি কোনও বামপন্থী নিগড়ে, আত্মপরিচয় সন্ধানের সমার্থক হয়ে উঠেছে তা কখনও কখনও। যেমন, শক্তিপদ-পূর্ববর্তী কবি দেবেন্দ্রকুমার পাল চৌধুরীর 'হাফলং হিল' নামের একটি অসামান্য কবিতা আছে, তাতে আকাশে সদ্য-ওঠা তারাদের দেখে কবির মনে হচ্ছে—

ব্রাসো দেওয়া ঝিকিমিকি
পিত্তল-পিন্
আকাশেরে এঁটে দিল
সন্ধ্যা-তিমিরে।

আবার যে অশোকবিজয় রাহা সিলেট থেকে কলকাতা যাবার মাঝখানে কর্মসূত্রে অল্পদিনের অতিথি হয়েছিলেন বরাক উপত্যকার, তিনিও কবিতা লিখেছিলেন নাগারানির পবিত্র চুল নিয়ে, কিংবা কাছাড়ের ডলু-পাহাড়ের জ্যোৎস্না রাতকে নিয়ে। রামেন্দ্র দেশমুখ্যের 'প্রেমিকা শহর' (*শিলচর*) যেমন এক কবির স্বদেশভূমিতে ফিরে আসার আর্তি, তেমনি সুধীর সেনের 'রিহাং নৃত্য' তো প্রতিবেশী-চেতনারই দুর্মর সাক্ষ্য।

...সাপের মতন
যেন সে পেরিয়ে এল ত্রিপুরার পাহাড়িয়া বন।

এই ভূগোল-চৈতন্যের আরেকটি মুখও আমরা খুঁজে পাই আসামে। না, শুধু আসামেই নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। ত্রিপুরার বাংলা কবিতার এক অন্যতম পাওয়ার হাউস যেমন কবি সমরজিৎ সিংহ, যাঁর মাতৃভাষা আসলে বাংলা নয়, বরাক উপত্যকারও তেমনি আছেন এক পাওয়ার হাউস—বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরিভাষী কিংবা ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ। যে-কোনও বাঙালি ছেলের ঘাড় ধরে তাকে তার মাতৃভাষা শেখানোর অবিশ্বাস্য ক্ষমতা ধরেন এঁরা। তাই ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ যখন তাঁর 'পঁচিশে বৈশাখ' নামক কবিতায় লেখেন—

আমাদের শব্দ অর্থ পরেছে
গাধার টুপি, আর
আনুষঙ্গহীন পরিধান।

তিনি তো এক সাংস্কৃতিক ভূগোলেরই পরিসরের কথা বলেন, যে পরিসর 'রুদ্ধশ্বাস বিজ্ঞাপন মায়া'-য় আস্তে আস্তে হারিয়ে যেতে বসেছে। কিংবা বরাক উপত্যকার বধূ পঞ্জাবি-ভাষী অনীতা দাস ট্যান্ডন একটি ককবরক কবিতা পাঠ করে যখন লেখেন—

নোয়াই পাখি, তুমি ফিরে এসো।
নোয়াই পাখি, তুমি ফিরে এসো।
তোমার পালকে লুকানো চিঠিটি
আজও তুমি কাউকে দিতে পারনি।
নোয়াই পাখি, তুমি ফিরে এসো

বসে আছি তোমার পালকে
লুকানো সেই চিঠির অপেক্ষায়

তখন ভৌগোলিক সেই চৈতন্যের কী অসামান্য বিস্তার ঘটে দেখুন—ঠিক যেমন তা ঘটে অসমিয়া দুই কবি সমীর তাঁতি আর সনন্ত তাঁতির বাংলাভাষায় লেখা কবিতায়। তখন কি মনে হয় না যে ভূগোল-চেতনা তো আসলে সাংস্কৃতিক এবং মানসিক কাঁটাতারগুলিকে ছাড়িয়ে যাওয়ারই নাম হয়ে উঠেছে এই আসামে তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে? সত্যিকারের ভূগোল জ্ঞান তো কেবল বৈচিত্র্যই মানে, কোনও ঘেরাটোপ মানে না।

গত শতাব্দীর আশির দশকে বরাক উপত্যকার কবিতা চর্চায় উঠে এল কিছু নতুন মুখ। এঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন বরাকভূমিরই সন্তান এবং এই মাটির কাছে জন্মসূত্রে দায়বদ্ধ। অর্থাৎ পূর্বসূরিদের মতো কোনও উদ্বাস্তু জীবনযাত্রা এঁদের কাউকে স্পর্শ করেনি। দেশভাগ তাঁদের কাছে আর তাঁদের পূর্বসূরিদের মতো কোনও অমোঘ বাস্তবতা হয়ে দেখা দিল না। বরং তা যেন তাঁদের সময়ে এসে হয়ে উঠলো এক প্যান্ডোরার বাক্স, যাকে তাঁরা আর খুলে ধরতে চাইলেন না। ১৯৮০-র দশক যদিও বরাক উপত্যকার মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে ছিল সর্বতোভাবেই এক হতাশার দশক, কারণ ততদিনে ছ'য়ের দশকের সেই 'ভাষা সার্কুলার' —'বিদেশি বিতাড়ন' নাম নিয়ে নতুন এক রাজনৈতিক মোড়কে বাঙালিদের বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করেছে; বরাক উপত্যকার কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকারদের কাছে এই দশকটি কিন্তু একটি কারণে হয়ে উঠলো নতুন আশার আলোকবাহী। এই সময় থেকেই বরাকের কবি-লেখকরা এক নতুন ভূমির, নতুন দেশের সন্ধানী হয়ে উঠলেন। তাঁদের মুখ আর কোনও কল্পিত কলকাতার দিকে ফেরানো রইলো না। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য কবিদের তালিকায় আছেন পার্থপ্রতিম মৈত্র, শঙ্করজ্যোতি দেব, মঞ্জুগোপাল দেব, জয়দেব ভট্টাচার্য, বিজয়কুমার ভট্টাচার্য, সৌমিত্র বৈশ্য, সুব্রতকুমার রায়, ভাস্করজ্যোতি দেব। মোটামুটিভাবে এই সময় থেকেই সাধারণ মানুষ —কাঁচা, বোবা, নিরক্ষর, অসহায় মানবসম্পদ ও তাদের জীবনযাপন, লিঙ্গবৈষম্য, ইত্যাদি সব বিষয় হয়ে উঠলো বরাকের কবিতা গল্প-নাটকের। আবার আটের দশক শেষ হয়ে গেলেও বরাক উপত্যকা কিন্তু আবার ১৯৬১-র 'ভাষা সংগ্রাম' নিয়ে কোনও মহা আখ্যানের জন্ম দিতে পারলো না,—হয়তো ততদিনে সেই 'ভাষা আন্দোলন'-এর মূল রাজনৈতিক বার্তাটি সমাজ থেকেই হারিয়ে যাচ্ছিল বলে। কারণ ন'য়ের দশকে এসে 'ভাষা আন্দোলন' প্রায় এক সাংস্কৃতিক স্মারকে রূপান্তরিত হলো—অনুরূপা বিশ্বাস, দিলীপকান্তি লস্কর, আর বিজয়কুমার ভট্টাচার্য তথা পথনাটককারদের প্রতি বছরে লিখে যাওয়া ও সেই আন্দোলনের স্মৃতি উসকে দেওয়া রক্তাক্ত হৃদয়গাথাগুলি সত্ত্বেও।

বরাক উপত্যকা ছেড়ে-যাওয়া দুই কবি-প্রতিভা স্বর্ণালী বিশ্বাস ভট্টাচার্য ও সপ্তর্ষি বিশ্বাস যেমন অবচেতনেই তাঁদের ভূগোলকে মনের ভেতর গেঁথে নিয়ে যান, তেমনি এই আসাম দেশেই তো উত্তরবঙ্গের মানচিত্র-প্রান্তর-তিস্তা-তোর্ষা মাথায় করে নিয়ে ব্রহ্মপুত্র উপ্যতকায় বসতি গাড়েন দুই কবি বিকাশ সরকার আর অভিজিৎ চক্রবর্তী। তারপর কী হয় দেখুন। বিকাশ এই ভূগোলে বসেই তাঁর শৈশবের গ্রাম গয়েরকাটার দিকে এক অনন্ত মানসভ্রমণে মেতে ওঠেন। মানচিত্রের অবরোধ ভেঙে পড়ে। এক প্রান্তিকতা আরেক

প্রান্তিকতাকে কাছে টেনে নেয়। কারণ কে না-জানে, আজকের রাজনৈতিক মানচিত্রে, কলকাতার কাছে উত্তরবঙ্গ এখনও এক প্রান্তই।

হোজাই পেরিয়ে তারপর একবার ডংকা মোকামের
দিকে যাই
বাসের ভিতর বসে বিহুগান গেয়েছিল ভ্যালেরির বউ
উমলিনে গারোবালিকার পিঠে ছিল কার জানি
নখের আঁচড়
নেলির পথে বসে আমরাও কম তো দেখিনি
বলো নরসংহার

আর, অভিজিৎ চক্রবর্তী তাঁর পত্রিকার নাম দেন 'কবিতার পূর্বোত্তর'। ভৌগোলিক প্রান্ত এভাবেই আরেক ভৌগোলিক প্রান্তের সংহতকরণের চেষ্টা চালায়। অরিজিৎ-এর একটি কবিতা দেখুন :

কিছু কবিতা বাপ-মা মরা সংসারে রুগ্‌ণ ছেলেটার মতো
গামছা জড়িয়ে যে ঠাকুর দেয় সকালে সন্ধ্যায়
যে সহিষ্ণু মাছ-কোটা শিখে নেয়
যে জানে আদা চিরে কাঁচালঙ্কা বাঁটা, জানে রসুন ফোঁড়ন
স্বপ্নে যে মুরগি পালে, ডিম ফোটায়, আনে স্বচ্ছলতা
আর ব্যবসা দাঁড়ালে যে ভাইটার বিয়ে দেবার
অপেক্ষায় আছে
হ্যাঁ, একটা পুংলিঙ্গ আছে বটে তারও, নতমুখ
এমনকি নিম্নবিত্ত গাদাগাদি রাতেও মাথা-তোলার
সাহস করে না
নখে হলুদ এইসব বাংলা কবিতার সঙ্গে
গুয়াহাটি-শিলচরের বাসে আমার প্রায়শই দেখা হয়ে যায়।

মনে হয় না কি গুয়াহাটি শিলচরের এই পথটিই শেষ পর্যন্ত আমাদের পার্ক স্ট্রিট হয়ে উঠছে যেরকম তা এর আগে হয়েছিল দেবাশিস তরফদারের এই পথটি নিয়ে লেখা এক দীর্ঘ কবিতায়?

মনে হয় না কি যে-ভূগোল চেতনার সঙ্গে নান্দনিকতার সহাবস্থান এককালে এতদ্দেশের কবিতায় সচরাচর ঘটতো না—একালে এসে তা কেমন অনায়াসেই ঘটে যেতে পারছে। মনে হয় না কি, এই ভূগোল-চৈতন্য আসলে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আবহে, এক দার্শনিকতারও রূপ পরিগ্রহ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে কোথাও ভেতর ভেতর?

সেই যে লিখেছিলেন বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত তাঁর 'ঠিকানা' নামের এক অবাক-করা কবিতায় —তারই মতো :

বিদেশী, দেখি তো তুমি কার মাটি কার বা গড়ন, বলো কে তোমার ফুল!
কোথায় তোমাকে বুনতে চাষা আজ কাঁধে করে ভোরের লাঙল,
কতো দূর গিয়ে এই চরাচর শূন্য ঠেকে, কদ্দুর ঠিকানা আজও হয়ে আছে ভুল।

❑ প্রাবন্ধিক শিলচরের (জন্ম ১৯৬২) বাসিন্দা এবং কবি—**সম্পাদক**।